আল মুদ্দাস্‌সির

৭৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْمُدَّثِّر শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয় ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মার কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে একথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোন অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইমাম যুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

"কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোন কোন সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন চূড়ার কাছাকাছি পৌছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন ঃ 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অশান্তি ও অস্থিরতার ভাব বিদূরিত হতো।" (ইবনে জারীর)

এরপর ইমাম যুহরী নিজে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ধৃত করছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فترة الوحى (অহী বন্ধ থাকার সময়)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা

গিরি গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ীতে পৌঁছেই বললাম ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কম্বল) দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেনঃ .... يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্ব–প্রথম যে অহী পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সূরা 'আলাকে'র প্রথম পাঁচটি আয়াত। এতে শুধু বলা হয়েছিল ঃ

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'জমাট রক্ত' থেকে। পড়, তোমার রব বড় মহানুভব। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এটা ছিল অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কত বড় মহান কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে এ বাণীতে তাঁকে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়েছিল না। বরং শুধু একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়েই কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে অহী নাযিলের এ প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মন–মানসিকতার ওপর যে কঠিন চাপ পড়েছিল তার প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। এ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বান্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিন। আর এ পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জেঁকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাথে সাথে তাঁকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবী হলো আপনার নিজের জীবন যেন সব দিক থেকে পূত–পবিত্র হয় এবং আপনি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংস্কার–সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে

কোন কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদ মুসিবতই আসুক না কেন আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

আল্লাহর এ ফরমান কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং একের পর এক কুরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হচ্ছিলো তা শুনাতে থাকলেন তখন মক্কায় রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল এবং বিরোধিতার এক তুফান শুরু হলো। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মওসূম এসে পড়লে মক্কার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, এ সময় সমগ্র আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এসব কাফেলার অবস্থান স্থলে হাজির হয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হজ্জের জনসমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের মত অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী বাণী শুনাতে থাকেন তাহলে সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে তাঁর আহবান পৌঁছে যাবে এবং না জানি কত লোক তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তাই কুরাইশ নেতারা একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করলো। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মক্কায় হাজীদের আগমনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সমবেত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো ঃ আপনারা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে লোকদের কাছে বিভিন্ন রকমের কথা বলেন, তাহলে আমাদের সবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোন একটি বিষয় স্থির করে নিন যা সবাই বলবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলো, আমরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণক বলবো। ওয়ালীদ বললো ঃ তা হয় না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমরা গণকদের অবস্থা জানি। তারা গুণ গুণ শব্দ করে যেসব কথা বলে এবং যে ধরনের কথা বানিয়ে নেয় তার সাথে কুরআনের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। তখন কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তাব করলো যে, তাকে পাগল বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে পাগলও নয়। আমরা পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্ক লোক সম্পর্কেও জানি। পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে মানুষ যে ধরনের অসংলগ্ন ও আবোল তাবোল কথা বলে এবং খাপছাড়া আচরণ করে তা কারো অজানা নয়। কে একথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী পেশ করছে তা পাগলের প্রলাপ অথবা জিনে ধরা মানুষের উক্তি? লোকজন বললোঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলি। ওয়ালীদ বললো ঃ সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কোন ধরনের কবিতার সাথে এ বাণীর সাদৃশ্য নেই। লোকজন আবার প্রস্তাব করলো ঃ তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে যাদুকরও নয়। যাদুকরদের সম্পর্কেও আমরা জানি। যাদু প্রদর্শনের জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে। একথাটিও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে খাটে না। এরপর ওয়ালীদ বললো ঃ প্রস্তাবিত এসব কথার যেটিই তোমরা বলবে সেটিকেই লোকেরা অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, এ বাণীতে আছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এর শিঁকড় মাটির গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা–প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান। একথা শুনে আবু জেহেল ওয়ালীদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে বললো ঃ যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কোন কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কওমের লোকজন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে বললো

ঃ তাহলে আমাকে কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও। এরপর সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললো ঃ তার সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি যাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ওয়ালীদের একথা সবাই গ্রহণ করলো। অতপর হজ্জের মওসুমে পরিকল্পনা অনুসারে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের তারা এ বলে সাবধান করতে থাকলো যে, এখানে একজন বড় যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে। তার যাদু পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ালো এই যে, কুরাইশ বংশীয় লোকেরা নিজেরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম সমগ্র আরবে পরিচিত করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯। আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতেই যে ওয়ালীদ এ উক্তি করেছিল, সে কথা ইবনে জারীর তার তাফসীরে ইকরিমার রেওয়ায়াত সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন)।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হয়েছে এভাবে ঃ

৮ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছেঃ মহান আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অঢেল নিয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম দুশমনী করেছে। এ পর্যায়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। একদিকে সে মনে মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে নিজ গোত্রের মধ্যে সে তার নেতৃত্ব, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিপন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু ঈমান গ্রহণ থেকেই বিরত রইলো না। বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে বুঝা-পড়া ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর আল্লাহর বান্দাদের এ বাণীর ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তাব করলো যে, এ কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতে হবে। তার এ স্পষ্ট ঘৃণ্য মানসিকতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, নিজের এতো সব অপকর্ম সত্ত্বেও এ ব্যক্তি চায় তাকে আরো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হোক। অথচ এখন সে পুরস্কারের যোগ্য নয় বরং দোযখের শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

এরপর ২৭ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত দোযখের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর ৪৯-৫৩ আয়াতে কাফেরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে বেপরোয়া ও নির্ভীক এবং এ পৃথিবীকেই

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ বলে মনে করে, তাই তারা কুরআন থেকে এমনভাবে পালায়, যেমন বন্য গাধা বাঘ দেখে পালায়। তারা ঈমান আনার জন্য নানা প্রকারের অযৌক্তিক পূর্বশর্ত আরোপ করে। অথচ তাদের সব শর্ত পূরণ করা হলেও আখেরাতকে অস্বীকার করার কারণে তারা ঈমানের পথে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সবার জন্য এক উপদেশবাণী যা সবার সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা, যার নাফরমানী করতে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এমন যে, যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অনুসরণ করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পূর্বে সে যতই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,[১] ওঠো এবং সাবধান করে দাও,[২] তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,[৩] তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,[৪] অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো,[৫] বেশী লাভ করার জন্য ইহসান করো না[৬] এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।[৭]

১. ওপরে ভূমিকায় আমরা এসব আয়াত নাযিলের যে পটভূমি বর্ণনা করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথাটি ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে يَاَيُّهَا النَّبِىُّ বা يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন কেন করা হয়েছে। নবী (সা) যেহেতু হঠাৎ জিবরাঈলকে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় বাড়ীতে পৌছে বাড়ীর লোকদের বলেছিলেন : আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। তাই আল্লাহ তাঁকে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এ সূক্ষ্ম ভংগী থেকে আপনা আপনি এ অর্থ পরিস্ফূটিত হয়ে ওঠে যে, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছো কেন? তোমার ওপরে তো একটি মহত কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে।

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এটাও সে ধরনের আদেশ। হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল :

اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

"তোমার নিজের কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদের সাবধান করে দাও।" (নূহ, ১)

আয়াতটির অর্থ হলো, হে বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি ওঠো। তোমার চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দারা অবচেতন পড়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যদি এ

অবস্থায়ই তারা থাকে তাহলে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। তাদের জানিয়ে দাও, তারা 'মগের মুল্লুকে' বাস করছে না যে, যা ইচ্ছা তাই করে যাবে, অথচ কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

৩. এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটিই তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্ব–জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহই শ্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "আল্লাহু আকবার" ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। আল্লাহু আকবার কথাটি বলে মানুষ নামায শুরু করে এবং বার বার আল্লাহু আকবার বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে। তাকবীর ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই প্রথমবারের মত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবুওয়াতের বিরাট গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোর 'শানে নুযুল' থেকেই সে বিষয়টি জানা গিয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, যে শহর ও সমাজপরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রভূমি বা লীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল, তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই "ওঠো এবং সাবধান করে দাও" বলার পরপরই "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো" বলার অর্থই হলো, যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার 'রব' তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর দীনের কাজ করতে উদ্যত কোন ব্যক্তির হিম্মত বৃদ্ধি ও সাহস যোগানোর জন্য এর চাইতে বড় পন্থা বা উপায় আর কি হতে পারে? আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নকশা যে ব্যক্তির হৃদয়–মনে খোদিত সে আল্লাহর জন্য একাই গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামান্যতম দ্বিধা–দ্বন্দ্বও অনুভব করবে না।

৪. এটি একটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক কথা। এর অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখো। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন পবিত্র আত্মা ময়লা-নোংরা ও পূতিগন্ধময় দেহ এবং অপবিত্র পোশাকের মধ্যে মোটেই অবস্থান করতে পারে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন। এ নির্দেশের ফল স্বরূপ নবী (সা) মানব জাতিকে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্য জাতিসমূহও সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতে এমন কোন শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না যা 'তাহারাত' বা পবিত্রতার সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা হলো, হাদীস এবং ফিকাহর গ্রন্থসমূহে ইসলামী হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে সব আলোচনা শুরু হয়েছে "কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা নামে অধ্যায় দিয়ে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পার্থক্য এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও পন্থাসমূহ একান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

একথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ধর্মাচরণের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল তাহলো, যে মানুষ যতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন হবে সে ততো বেশী পূত-পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরলেই মনে করা হতো, সে একজন দুনিয়াদার মানুষ। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি নোংরা ও ময়লা জিনিসকে অপছন্দ করে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে আহবানকারীর বাহ্যিক অবস্থাও এতটা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার ব্যক্তিত্বে এমন কোন দোষ-ত্রুটি যেন না থাকে যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

একথাটির তৃতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই থাকবে তবে তাতেও কোন প্রকার গর্ব-অহংকার, প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, ঠাটবাট এবং জৌলুসের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকা উচিত নয়। পোশাক এমন একটি প্রাথমিক জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। কোন ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে কেমন স্বভাব চরিত্রের লোক। নওয়াব, বাদশাহ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকদের পোশাক, ধর্মীয় পেশার লোকদের পোশাক, দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী লোকদের পোশাক, বাজে ও নীচ স্বভাব লোকদের পোশাক এবং গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বখাটে লোকদের পোশাকের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এসব পোশাকই পোশাক পরিধানকারীর মেজাজ ও মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর মেজাজ ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসব লোকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তাই তার পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া উচিত। তাঁর উচিত এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যা দেখে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ, যাঁর মন-মানস কোন প্রকার দোষে দুষ্ট নয়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো। নিজেকে পবিত্র রাখো। অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, 'আতা, মুজাহিদ, কাতাদা, সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্‌সিরের মতে এটিই এ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখো এবং সব রকমের দোষ-ক্রটি থেকে দূরে থাকো। প্রচলিত আরবী প্রবাদ অনুসারে যদি বলা হয় যে, فلان طاهر الثياب وفلان طاهر الذيل 'অমুক ব্যক্তির কাপড় বা পোশাক পবিত্র অথবা অমুক ব্যক্তি পবিত্র।" তাহলে এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র খুবই ভাল। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় فلانٌ دنس الثياب অমুক ব্যক্তির পোশাক নোংরা তাহলে এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি লেনদেন ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ভাল নয়। তার কথা ও প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রাখা যায় না।

৫. অপবিত্রতার অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা। তা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উঠা বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চারদিকে গোটা সমাজে হরেক রকমের যে অপবিত্রতা ও নোংরামি ছড়িয়ে আছে তার সবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেউ যেন তোমাকে একথা বলার সামান্য সুযোগও না পায় যে, তুমি মানুষকে যেসব মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করছো তোমার নিজের জীবনেই সে মন্দের প্রতিফলন আছে।

৬. মূল বাক্যাংশ হলো وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ একথাটির অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র কথায় অনুবাদ করে এর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবে, নিস্বার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাংখাও তোমার থাকবে না। অন্য কথায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইহ্‌সান করো, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইহ্‌সান করো না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো। যদিও তা একটি বড় রকমের ইহ্‌সান, কারণ তোমার মাধ্যমেই আল্লাহর গোটা সৃষ্টি হিদায়াত লাভ করছে। তবুও এ কাজ করে তুমি মানুষের বিরাট উপকার করছো এমন কথা বলবে না এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো, তুমি যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছো কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবে না এবং কোন সময় এ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ
شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ
لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

তবে যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন হবে।[৮] কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।[৯] আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে[১০] ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি।[১১] তাকে অঢেল সম্পদ দিয়েছি এবং আরো দিয়েছি সবসময় কাছে থাকার মত অনেক পুত্র সন্তান।[১২] তার নেতৃত্বের পথ সহজ করে দিয়েছি। এরপরও সে লালায়িত, আমি যেন তাকে আরো বেশী দান করি।[১৩] তা কখনো নয়, সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব। সে চিন্তা–ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো। অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? আবার অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতপর পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। অবশেষে বললো ঃ এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তাও যেন তোমার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের এ দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা–সাধনা করে তুমি তোমার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছো।

৭. অর্থাৎ যে কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ–কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার নিজের কওম তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র আরব তোমার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগবে। তবে এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ–মুসিবতই আসুক না কেন তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়–ভীতি, লোভ–লালসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং

ভালবাসা সব কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এসবের মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজের অবস্থানে স্থির ও অটল থাকবে।

এগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে সময় নবুওয়াতের কাজ শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে সময় এ দিকনির্দেশনাগুলো তাঁকে দিয়েছিলেন। কেউ যদি এসব ছোট ছোট বাক্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে তার মন বলে উঠবে যে, একজন নবীর নবুওয়াতের কাজ শুরু করার প্রাক্কালে তাঁকে এর চাইতে উত্তম আর কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে না। এ নির্দেশনায় তাঁকে কি কাজ করতে হবে একদিকে যেমন তা বলে দেয়া হয়েছে তেমনি এ কাজ করতে গেলে তাঁর জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং আচার–আচরণ কেমন হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে তাঁকে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে কি নিয়ত, কি ধরনের মানসিকতা এবং কিরূপ চিন্তাধারা নিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আর এতে এ বিষয়েও তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজ করার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে। বর্তমানেও যারা বিদ্বেষের কারণে স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো দেখুক এবং নিজেরাই চিন্তা করুক যে, এগুলো কোন মৃগী রোগে আক্রান্ত মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা না কি মহান আল্লাহর বাণী যা রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি তাঁর বান্দাকে দিচ্ছেন?

৮. আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, এ সূরার এ অংশটা প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের কয়েক মাস পরে এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম বারের মত হজ্জের মওসুম সমাগত হলো এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, বহিরাগত হাজীদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার এক সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। এ আয়াতগুলোতে কাফেরদের এ কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর একথাটি দ্বারাই পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ঠিক আছে, যে ধরনের আচরণ তোমরা করতে চাচ্ছ তা করে নাও। এভাবে পৃথিবীতে তোমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? (শিংগা সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বা–হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১, ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭, আয্‌ যুমার, টীকা ৭৯ এবং ক্বাফ, টীক ৫২)

৯. এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এ ছাড়া বাক্যটি থেকে এ অর্থও প্রতিফলিত হয় যে, সেদিনটির কঠোরতা কাফেরদের জন্য স্থায়ী

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

এ তো মানুষের কথা মাত্র।[১৪] শিগগিরই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। তুমি কি জানো, সে দোযখ কি? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না।[১৫] গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে।[১৬] সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন কর্মচারী। আমি[১৭] ফেরেশতাদের দোযখের কর্মচারী বানিয়েছি[১৮] এবং তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি।[১৯] যাতে আহলে কিতাবদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।[২০] ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়,[২১] আহলে কিতাব ও ঈমানদাররা সন্দেহ পোষণ না করে[২২] আর যাদের মনে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা যেন বলে, এ অভিনব কথা দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছে?[২৩] এভাবে আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন।[২৪] তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।[২৫] আর দোযখের এ বর্ণনা এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই নয় যে, মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২৬]

হয়ে যাবে। তা এমন ধরনের কঠোরতা হবে না যা পরে কোন সময়ে হালকা বা লঘু হয়ে যাওয়ার আশা করা যাবে।

১০. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে নবী, কাফেরদের সে সম্মেলনে যে ব্যক্তি (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা) তোমাকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের কাছে তোমাকে যাদুকর বলে প্রচার করতে হবে তার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন

আমার কাজ হলো, তার সাথে বুঝাপড়া করা। তোমার নিজের এ বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১. একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন–সম্পদ, সন্তান–সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের খোদায়ী ও প্রভূত্ব কায়েম রাখার জন্য সে তোমার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না।

১২. ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شُـهُـوْدً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা–সমিতিতে উপস্থিত থাকে। তিন, তারা সবাই এমন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ বা মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৩. একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্ত্বেও তার লালসা ও আকাংখার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হযরত হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলতো ঃ মুহাম্মাদের (সা) একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

১৪. মক্কায় কাফেরদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সে সম্মেলনে সংঘটিত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। সূরার ভূমিকায় ঘটনাটির যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ ব্যক্তি মনে প্রাণে যে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। কিন্তু নিজের গোত্রের মধ্যে তার মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। কাফেরদের সে সম্মেলনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাবিত অভিযোগসমূহ সে নিজেই যখন খণ্ডন করলো তখন আরবের লোকদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে নবীকে (সা) বদনাম করা যায় এমন কোন অভিযোগ তৈরি করে পেশ করতে খোদ তাকেই বাধ্য করা হলো। এ সময় সে যেভাবে তার বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বেশ কিছু সময় কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার পর পরিশেষে সে যেভাবে একটি অভিযোগ তৈরি করলো, তার একটা পূর্ণাংগ চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। আরেক জায়গায় কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' (আল আ'লা, ১৩)। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এই যে, আযাবের উপযুক্ত কেউ-ই তার কবল থেকে রক্ষা পাবে না। আর যে তার কবলে পড়বে তাকেই আযাব থেকে রেহাই দেবে না।

১৬. 'তা দেহের কোন অংশই না জ্বালিয়ে ছাড়বে না' একথা বলে আবার "চামড়া ঝলসিয়ে দেবে" কথাটি আলাদা করে উল্লেখ করাটা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের আযাবের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মূলত মুখমণ্ডল ও দেহের চামড়াই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে বা প্রকাশ করে। তাই চেহারা ও গাত্রচর্মের কুৎসিত দর্শন ও কুশ্রী হওয়া তার জন্য সর্বাধিক মানসিক যন্ত্রণার কারণ হবে। শরীরের আভ্যন্তরীণ অংগ-প্রত্যংগে তার যত কষ্ট ও যন্ত্রণাই হোক না কেন সে তাতে ততটা মানসিক যাতনাক্লিষ্ট হয় না। যতটা হয় তার চেহারা কুৎসিৎ হলে কিংবা শরীরের খোলা মেলা অংশের চামড়া বা ত্বকের ওপর বিশ্রী দাগ পড়লে। কারণ কোন মানুষের চেহারা ও গাত্র চর্মে বিশ্রী দাগ থাকলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই বলা হয়েছে ঃ এ সুদর্শন চেহারা এবং অত্যন্ত নিটোল ও কান্তিময় দেহধারী যেসব মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্ব গৌরবে আত্মহারা তারা যদি আল্লাহর আয়াতের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মত শত্রুতার আচরণ করতেই থাকে তাহলে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে বিকৃত করে দেয়া হবে আর তাদের গাত্রচর্ম পুড়িয়ে কয়লার মত কাল করে দেয়া হবে।

১৭. এখান থেকে "তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "দোযখের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল প্রাসংগিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কাছে একথাটি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, এক দিকে আমাদের বলা হচ্ছে, আদম আলাইহিস সাল্লামের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ কুফরী করেছে এবং কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়েছে তাদের সবাইকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর দিকে আমাদের জানানো হচ্ছে যে, এত বড় বিশাল দোযখে অসংখ্য মানুষকে আযাব দেয়ার জন্য মাত্র উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে। একথা শুনে কুরাইশ নেতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আবু জেহেল বললো ঃ আরে ভাই, তোমরা কি এতই অকর্মা ও অথর্ব হয়ে পড়েছো যে, তোমাদের মধ্য থেকে দশ দশ জনে মিলেও দোযখের এক একজন সিপাইকে কাবু করতে পারবে না? বনী জুমাহ্‌ গোত্রের এক পালোয়ান সাহেব তো বলতে শুরু করলোঃ সতের জনকে আমি একাই দেখে নেব। আর তোমরা সবাই মিলে অবশিষ্ট দুই জনকে কাবু করবে। এসব কথার জবাব হিসেবে সাময়িকভাবে প্রসংগ পাল্টে একথাগুলো বলা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাংঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

১৯. অর্থাৎ দোযখের কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার বাহ্যত কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা আমি এ জন্য উল্লেখ করলাম যাতে তা সেসব লোকের জন্য ফিতনা হয়ে যায় যারা নিজেদের মনের মধ্যে এখনও কুফরী লুকিয়ে রেখেছে। এ ধরনের লোক বাহ্যিকভাবে ঈমানের প্রদর্শনী যতই করুক না কেন তার অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশেও যদি সে আল্লাহর উলুহিয়াত ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা কিংবা অহী ও রিসালাত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বও পোষণ করে থাকে তাহলে আল্লাহর এত বড় জেলখানায় অসংখ্য অপরাধী মানুষ ও জিনকে শুধু উনিশ জন সিপাই সামলে রাখবে এবং আলাদাভাবে প্রত্যেককে শাস্তিও দেবে একথা শোনামাত্র তার লুকিয়ে রাখা কুফরী স্পষ্ট বেরিয়ে পড়বে।

২০. কোন কোন মুফাস্‌সির এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টান) ধর্মগ্রন্থেও যেহেতু দোযখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা শোনামাত্র তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর কথাই হবে। কিন্তু আমাদের মতে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রথম কারণটি হলো, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ বর্তমানে দুনিয়ায় পাওয়া যায় তাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ জন একথা কোথাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, কুরআনের বহুসংখ্যক বক্তব্য আহলে কিতাবের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যের অনুরূপ। কিন্তু ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে একথাটির সঠিক অর্থ হলো ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ, একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের অসংখ্য বাণ নিক্ষিপ্ত হবে। তা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রেরিত অহীতে যে কথা বলা হয়েছে, তা তিনি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সবার সামনে পেশ করলেন এবং কোন প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপের আদৌ পরোয়া করলেন না। জাহেল আরবরা নবীদের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু আহলে কিতাব গোষ্ঠী ভাল করেই জানতো যে, প্রত্যেক যুগে নবীদের নীতি ও পদ্ধতি এটাই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে যা কিছু আসতো মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক তারা তা হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ চরম প্রতিকূল পরিবেশে রসূলকে (সা) বাহ্যত অদ্ভুত একথাটি কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে সরাসরি পেশ করতে দেখে অন্তত আহলে কিতাব গোষ্ঠীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, এটি একজন নবীর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আহলে কিতাব গোষ্ঠীর কাছ থেকে এ আচরণ লাভের প্রত্যাশা ছিল বেশী।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এ কর্মনীতি বেশ কয়েকবার প্রতিফলিত হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো মি'রাজের ঘটনা। তিনি কাফেরদের সমাবেশে নিসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এ বিস্ময়কর ঘটনা শুনে তাঁর বিরোধীরা কত রকমের কাহিনী ফাঁদবে তার এক বিন্দু পরোয়াও তিনি করেননি।

২১. একথাটি ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন ঈমানদার যদি তার ঈমানে অটল ও অচল থাকে এবং সন্দেহ–সংশয় কিংবা আনুগত্য পরিহার কিংবা দীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বর্জন করে দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা, আনুগত্য ও অনুসরণ এবং দীনের প্রতি আস্থা পোষণের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান দৃঢ়তা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩; আল আনফাল, আয়াত ২; টীকা ২; আত্‌ তাওবা, আয়াত ১৪৪ ও ১৪৫; টীকা ১২৫; আল আহযাব, আয়াত ২২; টীকা ৩৮; আল ফাত্‌হ, আয়াত ৪; টীকা ৭)।

২২. কুরআন মজীদে সাধারণত 'মনের রোগ' কথাটি মুনাফেকী অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার দেখে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন, এ আয়াতটি মদীনাতে নাযিল হয়েছে। কারণ, মদীনাতেই মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ ধারণা কয়েকটি কারণে ঠিক নয়। প্রথমত এ দাবী ঠিক নয় যে, মক্কায় মুনাফিক ছিল না। আমরা তাফহীমুল কুরআন সূরা আনকাবুতের ভূমিকায় এবং ১, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬নং টীকায় এ ভ্রান্তি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয়ত বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা যে, তা অন্য কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে এবং কোন পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে, এভাবে কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করা আমরা সঠিক মনে করি না। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহ থেকেই আমরা সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ অংশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানতে পারি। মক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ অংশটি নাযিল হয়েছিল। ঘটনার সাথে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি এ একটি বাক্য কয়েক বছর পর মদীনাতেই নাযিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে এ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে এনে জুড়ে দেয়ার কি এমন অবকাশ বা যুক্তি আছে? এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মনের রোগ' বলতে তাহলে কি বুঝানো হয়েছে? এর জবাব হলো, এর অর্থ সন্দেহের রোগ। অকাট্যভাবে এবং নিসংশয়ে আল্লাহ, আখেরাত, অহী, রিসালাত, জান্নাত ও দোযখ অস্বীকার করে এমন লোক শুধু মক্কায় নয় গোটা পৃথিবীতে আগেও যেমন কম ছিল এখনও তেমনি কম আছে। আল্লাহ আছেন কিনা, আখেরাত হবে কি হবে না, ফেরেশতা, জান্নাত ও দোযখ বাস্তবিকই আছে না কল্পকাহিনী মাত্র? রসূল কি প্রকৃতই রসূল ছিলেন? তাঁর কাছে কি সত্যিই অহী আসতো? প্রত্যেক যুগে এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। এ সন্দেহই অধিকাংশ মানুষকে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে নিমজ্জিত করেছে। তা

না হলে যারা এসব সত্য অকাট্যভাবে অস্বীকার করে পৃথিবীতে এরূপ নির্বোধের সংখ্যা কোন সময়ই বেশী ছিল না। কেননা যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বিবেক–বুদ্ধিও আছে সেও জানে যে, এসব বিষয়ের সত্য ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেয়া এবং অকাট্যভাবে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা একে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করছিলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা একথা বললেন কেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা বলতে চাচ্ছিলো যে, যে বাণীতে এরূপ বিবেক–বুদ্ধি বিরোধী ও দুর্বোধ্য কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর বাণী কি করে হতে পারে?

২৪. অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে তাঁর বাণী ও আদেশ–নির্দেশে এমন কিছু কথা বলেন যা মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কথা শুনে একজন সত্যপন্থী, সৎপ্রকৃতির এবং সঠিক চিন্তার লোক সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করে সঠিক পথ অনুসরণ করে একজন হঠকারী বক্রচিন্তাধারী এবং সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি সে একই কথার বাঁকা অর্থ করে তাকে ন্যায় ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটা নতুন বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে যেহেতু সত্যপন্থী তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন। কারণ, হিদায়াত প্রার্থী ব্যক্তিকে জোর করে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর নীতি নয়। শেষোক্ত ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হিদায়াত চায় না, বরং গোমরাহীকেই পছন্দ করে তাই আল্লাহ তাকে গোমরাহীর পথেই ঠেলে দেন। কারণ যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হকের পথে টেনে আনা আল্লাহর নীতি নয়। (আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত দান করা এবং গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করার বিষয়টি সম্পর্কে এ তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিচে উল্লেখিত জায়গাসমূহে দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ১০, ১৬, ১৯, ও ২০; আন নিসা, টীকা ১৭৩; আল আন'য়াম, টীকা ১৭, ২৮ ও ৯০; ইউনুস, টীকা ১৩; আল কাহ্‌ফ, টীকা ৫৪ এবং আল কাসাস, টীকা ৭১)

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব–জাহানে ভিন্ন ভিন্ন কত শত রকমের জীব–জন্তু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদের কত রকম শক্তি সামর্থ যে দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা কত রকম কাজ যে আঞ্জাম দিচ্ছেন একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র একটি গ্রহে বসবাসকারী মানুষ তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চার পাশের ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখে যদি এ ভুল ধারণা করে বসে যে, সে তার ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে যা কিছু দেখছে ও অনুভব করছে কেবল মাত্র সেগুলোই আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন তাহলে এটা তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন এ বিশ্ব–জাহান এত ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এর ব্যাপকতা ও বিশালতার সবটুকু জ্ঞানের স্থান সংকুলান তো দূরের কথা এর কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা তার সাধ্যাতীত।

২৬. অর্থাৎ দোযখের উপযুক্ত হয়ে যাওয়া এবং তার শাস্তিলাভের পূর্বেই লোকেরা যেন তা থেকে নিজেদের রক্ষার চিন্তা করে।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿৩২﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿৩৩﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿৩৪﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿৩৫﴾ نَذِيرًا
لِّلْبَشَرِ ﴿৩৬﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿৩৭﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِينَةٌ ﴿৩৮﴾ إِلَّا أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ﴿৩৯﴾ فِي جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿৪০﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿৪১﴾
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿৪২﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿৪৩﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِينَ ﴿৪৪﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿৪৫﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿৪৬﴾
حَتّٰى أَتٰنَا الْيَقِينُ ﴿৪৭﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِينَ ﴿৪৮﴾

২ রুকূ'

কখ্‌খনো না,[২৭] চাঁদের শপথ, আর রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে। ভোরের শপথ যখন তা আলোকোজ্জল হয়ে ওঠে। এ দোযখও বড় জিনিসগুলোর একটি।[২৮] মানুষের জন্য ভীতিকর। যে অগ্রসর হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায়[২৯] তাদের সবার জন্য।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।[৩০] তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া[৩১] যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে[৩২] "কিসে তোমাদের দোযখে নিক্ষেপ করলো।" তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না।[৩৩] অভাবীদের খাবার দিতাম না।[৩৪] সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম; প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।[৩৫] সে সময় সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।[৩৬]

২৭. অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা যাবে।

২৮. অর্থাৎ চন্দ্র এবং রাত–দিন যেমন আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন ঠিক তেমনি দোযখও আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের একটি। চাঁদের অস্তিত্ব যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে। রাত ও দিনের নিয়মানুবর্তিতার সাথে আগমন তথা আবর্তন যদি অসম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের মতে দোযখের অস্তিত্ব অসম্ভব হবে কি কারণে? রা দিন সব সময় যেহেতু তোমরা এসব জিনিস দেখছো তাই এগুলো সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন বিস্ময় জাগে না। অন্যথায় এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর কুদরতের এককেটি বিস্ময়কর মু'জিযা।

কোন সময় এসব জিনিস যদি তোমরা না দেখতে। আর এ অবস্থায় কেউ যদি তোমাদের বলতো যে, চাঁদের মত একটি জিনিস এ পৃথিবীতে আছে অথবা সূর্য এমন একটি বস্তু যা আড়ালে চলে গেলে দুনিয়া আঁধারে ঢাকা পড়ে এবং আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলে দুনিয়া আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলে একথা শুনেও তোমাদের মত লোকেরা অট্টহাসিতে ঠিক তেমনি ফেটে পড়তে যেমন দোযখের কথা শুনে আজ ফেটে পড়ছো।

২৯. এর অর্থ হলো, এ জিনিসটি দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলে এ জিনিসটিকে ভয় করে কল্যাণের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে পেছনে সরে যেতে পারে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা তূরের ১৬নং টীকা।

৩১. অন্য কথায় বাম দিকের লোকেরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে পাকড়াও হবে। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা দায়বদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে। (ডান ও বাঁ দিকের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, টীকা ৫ ও ৬)

৩২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে লাখ লাখ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও যখনই ইচ্ছা করবে কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই একে অপরকে দেখতে পাবে এবং সরাসরি কথাবার্তাও বলতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৪৪ থেকে ৫০, টীকা ৩৫; আস সাফ্ফাত, আয়াত ৫০ থেকে ৫৭, টীকা ৩২।

৩৩. এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবকে মেনে নিয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রাথমিক হক অর্থাৎ নামায ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। এ ক্ষেত্রে একথাটি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তেই পারে না যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। তাই নামাযী হওয়ার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু নামাযী না হওয়াকে দোযখে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে স্পষ্ট করে একথাই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে দোযখ থেকে বাঁচতে পারবে না।

৩৪. এ থেকে জানা যায় কোন মানুষকে ক্ষুধার্ত দেখার পর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় গোনাহ যে, মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাকেও একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত বিষয়টি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে যে সম্পর্কে আমরা গাফিল হয়ে পড়েছিলাম। নিশ্চিত বিষয় বলে মৃত্যু ও আখেরাত উভয়টিকেই বুঝানো হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যন্ত এ নীতি অনুসরণ করেছে তাদের জন্য শাফায়াত করলেও সে ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু স্থানে এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কে শাফায়াত করতে সক্ষম আর কে সক্ষম নয়, কোন

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا
يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا
يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

এদের হলো কি যে এরা এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।[৩৭] বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[৩৮] তা কখ্‌খনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখেরাতকে আদৌ ভয় করে না।[৩৯] কখ্‌খনো না[৪০] এ তো একটা উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না।[৪১] একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য।[৪২] এবং (তাকওয়ার নীতি গ্রহণকারীদের) ক্ষমার অধিকারী।[৪৩]

অবস্থায় শাফায়াত করা যায় আর কোন্ অবস্থায় যায় না। কার জন্য করা যায় আর কার জন্য যায় না এবং কার জন্য তা কল্যাণকর আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয় তা জানা কারো জন্য কঠিন নয়। পৃথিবীতে মানুষের গোমরাহীর বড় বড় কারণের মধ্যে একটি হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস পোষণ। তাই বিষয়টি কুরআন এত খোলামেলা ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে যে, এ ক্ষেত্রে সন্দেহের আর কোন অবকাশই বাকি রাখেনি। উদাহরণ স্বরূপ নিচে নির্দেশিত আয়াতসমূহ দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ২৫৫; আল আন'আম, ৯৪; আল আ'রাফ, ৫৩; ইউনুস, ৩ ও ১৮; মারয়াম, ৮৭; ত্বা–হা, ১০৯; আল আম্বিয়া, ২৮; সাবা ২৩, আয্ যুমার, ৪৩ ও ৪৪, আল মু'মিন, ১৮; আদ্ দুখান, ৮৬; আন নাজ্‌ম, ২৬ এবং আন নাবা, ৩৭ ও ৩৮। যেসব স্থানে এসব আয়াত আছে তাফহীমুল কুরআনের সেসব জায়গায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছি।

৩৭. এটা প্রচলিত একটি আরবী প্রবাদ। বন্য গাধার বৈশিষ্ট হলো বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র এত অস্থির হয়ে পালাতে থাকে যে আর কোন জন্তু তেমন করে না। এ জন্য আরবরা অস্বাভাবিক রকম অস্থির ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়নপর ব্যক্তিকে বাঘের গন্ধ বা শিকারীর মৃদু পদশব্দ শোনামাত্র পলায়নরত বন্য গাধার সাথে তুলনা করে থাকে।

৩৮. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। পত্রখানা এমন হবে যেন তা দেখে তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই এ পত্র লিখে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" (আল আন'আম, ২৪) অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" (বনী ইসরাঈল, ৯৩)

৩৯. অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। তাই তাদের এ ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই যে, এ দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তাদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। এ জিনিসটিই তাদেরকে এ পৃথিবীতে নিরুদ্বিগ্ন ও দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নকে তারা অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন সত্য তারা দেখতে পায় না যা অনুসরণ করার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় ভালই হয়ে থাকে এবং এমন কোন বাতিল বা মিথ্যাও তারা দুনিয়াতে দেখতে পায় না যার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতপক্ষে সত্য কি আর মিথ্যা কি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তারা নিরর্থক মনে করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনকে অস্থায়ী জীবন বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে, সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন হলো আখেরাতের জীবন যেখানে সত্যের ফলাফল অনিবার্যরূপে ভাল এবং মিথ্যার ফলাফল অনিবার্যরূপে মন্দ হবে, হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নটি কেবলমাত্র সে ব্যক্তির কাছেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। এ প্রকৃতির লোক কুরআনের পেশকৃত যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ এবং পবিত্র শিক্ষাসমূহ দেখেই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝার চেষ্টা করবে যে, কুরআন যেসব আকীদা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মকে ভ্রান্ত বলছে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে। কিন্তু আখেরাতকে অস্বীকারকারী, যে সত্যের অনুসন্ধানে নিষ্ঠাবান নয় সে ঈমান গ্রহণ না করার জন্য নতুন নতুন দাবী পেশ করতে থাকবে। অথচ তার যে কোন দাবীই পূরণ করা হোক না কেন সত্যকে অস্বীকার করার জন্য সে আরেকটি নতুন বাহানা খাড়া করবে। এ কথাটিই সূরা আন'আমে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী, আমি যদি কাগজে লিখিত কোন গ্রন্থও তোমার প্রতি নাযিল করতাম আর এসব লোকেরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতো তার পরও যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তারা বলতো, এতো স্পষ্ট যাদু।" (সূরা আল আন'আম, ৭)

৪০. অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কখ্খনো পূরণ করা হবে না।

৪১. অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ করা শুধু কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না বরং নসীহত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সে তখনই লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা তাকে নসীহত গ্রহণ করার সুমতি ও সুবুদ্ধি দান করে। অন্য কথায় এখানে এ সত্য তুলে ধরা

হয়েছে যে, বান্দার কোন কাজই এককভাবে বান্দার নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূল হয়। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝার কারণে মানুষের ধ্যান–ধারণা ও চিন্তা–ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচট খায়। অল্প কথায় বিষয়টি এভাবে বুঝা যেতে পারে, প্রতিটি মানুষ যদি পৃথিবীতে এতটা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলা ভেঙে পড়তো। বর্তমানে এ পৃথিবীতে যে নিয়ম শৃংখলা আছে তা এ কারণেই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা–ই করতে ইচ্ছা করুক না কেন তা সে কেবল তখনই করতে পারে যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে, সে তা করুক। হিদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। নিজের জন্য হিদায়াত কামনা করাই মানুষের হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত কেবল তখনই লাভ করে যখন আল্লাহ তার এ আকাংখা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে বান্দার পক্ষ থেকে গোমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে গোমরাহীর দাবী ও আকাংখা দেখে আল্লাহর ইচ্ছা যখন তাকে গোমরাহী ও ভ্রান্তির পথে চলার মঞ্জুরী ও ফায়সালা দেন তখনই কেবল সে ভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। এভাবে সে গোমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি চোর হতে চায়, তাহলে তার এ ইচ্ছাটুকুই এ জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে যেখানে ইচ্ছা, যে ঘর থেকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে। বরং আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপক জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তার এ ইচ্ছাকে যখন, যতটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন সে কেবল ততটুকুই পূরণ করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে নসীহত তোমাদের করা হচ্ছে তা এ জন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের কোন প্রয়োজন আছে এবং তোমরা তা না করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে। বরং এ নসীহত করা হচ্ছে এ জন্য যে, বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করুক এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে না চলুক এটা আল্লাহর হক বা অধিকার।

৪৩. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নাফরমানী যতই করে থাকুক না কেন যখনই সে এ আচরণ থেকে বিরত হয় তখনই আল্লাহ তার প্রতি নিজের রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। যেহেতু তিনি বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা আদৌ পোষণ করেন না তাই এমন হঠকারী তিনি নন যে, কোন অবস্থায়ই তাকে ক্ষমা করবেন না বা শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।